ISSN 2072-3334
Development Compilation
Volume 11. Number 01. March 2015

ফোকলোর: সামাজিক ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নকোটির মনন

ড. ফরিদা পারভীন কেয়া*

Abstract: Creating society is an important part in the history of human civilization. Accrossing thousand of years of civilzation human being gathered a huge experience and after a certain period those experience converted as social experiences. According to the economic perspectives the sub-alterns are the main character of the society. Folklore is spontaneous reflection of the people and the sub-alterns also. So History and Folklore is closely related with each other.

এক

ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ রাজনৈতিক উপনিবেশবাদের সমাপ্তি ঘটলেও পশ্চিমা অর্থনৈতিক উপনিবেশবাদের যাঁতাকল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে গোলকায়নের মাধ্যমে। গোলকায়ন অর্থনৈতিক ভিত্তির রূপরেখা নির্মাণের বন্ধুর পথ মসৃণ করে সাংস্কৃতিক গোলকায়নের এক আকর্ষণীয় প্যাকেজ নিয়ে প্রবেশ করেছে। এই প্যাকেজের সাহায্যে গোলকায়নের অধিভুক্ত দেশের আপন সংস্কৃতির পরিবর্তনজনিত সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। ক্ষতির পরিমান যাই হোক, সংস্কৃতিকে আমূল বদলে দেয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। কারণ সংস্কৃতির প্রকৃত ধারণকর্তা হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। সংস্কৃতির আরোপিত রূপ কখনই টেকসই হতে পারে না। সাধারণ মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নতুন বিষয় ও পরিস্থিতি আত্তীকরণ ও সাঙ্গীকরণ, যাদের অবস্থান অর্থনীতির স্বাভাবিক সূত্রে সমাজের নিম্নকোটিতে। মেনে নেয়া ও মানিয়ে নেয়ার আশ্চর্যজনক বিশেষ ক্ষমতার কারণেই ফোকলোর চর্চার ইতিহাস হাজার বছরের। তাই আমরা গভীর আস্থা ও নির্ভরতার সঙ্গে বলতে পারি যে, সাংস্কৃতিক গোলকায়নের অপ্রতিরোধ্য গতি নিয়ন্ত্রণের ভূমিকায় ফোকলোর অগ্রবর্তী সৈনিক। সাধারণ মানুষের সঙ্গে এক্ষেত্রে ফোকলোরের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। ফোকলোরের ধারক বাহক সকল শ্রেণী-পেশার মানুষ। সামাজিক অর্থনীতির কোন নির্দিষ্ট শ্রেণী গোষ্ঠীর সংস্কৃতিই শুধু ফোকলোর নয়, সকল সামাজিক-অর্থনৈতিক শ্রেণীর মানুষই ফোকলোরের স্রষ্টা। ধর্মীয়-অর্থনৈতিক-সামাজিক বিভেদের দেয়াল ভেঙে দিলে আত্মীয়তার খাতিরে সমাজের সব শ্রেণীর মানুষই ফোকলোরের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। বলতে দ্বিধা নেই যে, আত্মীয়তার প্রবহমানতা যতই ক্ষরস্রোতা হোক না কেন এর উৎস ও আধার কিন্তু অবৈদিক-অনার্য-অস্মার্ত-অপৌরাণিক জনমণ্ডলী। অর্থাৎ সামাজিক বিনির্মাণের মাধ্যমে যাদের 'সাধারণ মানুষ' বলা হয় তাদের শরীরে প্রবাহিত রক্তের সঙ্গে যারা 'সাধারণ মানুষ' বলে তাদের রক্তের রঙের কোন প্রভেদ নাই।

* Freelance Consultant (Training), CAMPE and GUS, Dhaka, Bangladesh.

রক্তের রঙের প্রভেদ না থাকলেও অধিক শারীরিক সক্ষমতা বা পেশী শক্তির প্রভাব ও অন্যের উপর নিজের মতামত চাপিয়ে দেয়ার মানসিকতার মাধ্যমে কিছু প্রভাবশালী চরিত্রের সৃষ্টি হয় সমাজে, যারা নিজেদের মতামতের মাধ্যমে সমাজ পরিচালনার দায়িত্ব নেয়। ফলে সমাজ বিভক্ত হয়ে পড়ে দুই শ্রেণীতে। এক শ্রেণী নিজের মতামত অনুযায়ী কাজ করে যা অন্যের উপর নির্যাতন, নিপীড়নের ভিত্তিভূমি প্রস্তুত করে। আর অন্য শ্রেণী যারা মতামত প্রদানের বা সংগঠিত মতামত বাস্তবায়নের কোন সুযোগ পায় না; এরা নির্যাতিত, নিপীড়িত, নিগৃহীত। অর্থাৎ দুইটি শ্রেণীর মাধ্যমে সমাজ চলমান। একপক্ষ অত্যাচার করে আর অন্যপক্ষ অত্যাচারিত হয়। সমাজ কাঠামোর তলানিতে 'সাধারণ মানুষের' অবস্থান বলে বিশেষ সামাজিক বিপ্লব ব্যতিত সমাজ কাঠামো পুনর্নির্মাণেও এরা কোন ভূমিকা রাখতে পারে না, কারণ রাখতে দেয়া হয় না। অর্থাৎ নির্যাতিত হওয়া যেন 'সাধারণ মানুষে'র উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া।

দুই

অর্থনৈতিক মানদণ্ডে নিম্নকোটির মানুষকে সমাজ একটি কাঠামোর মধ্যে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে এবং সে সামাজিক স্তরবিন্যাসের কারণে প্রতিবাদহীনতায় বাধ্য হয়েছে। সমাজ কাঠামো দাঁড় করানোর ভিত্তিভূমি হিসেবে ধর্মীয় বিশ্বাস ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ স্পষ্টভাবে বললে ধর্মবোধের ধারণা সমাজ কাঠামো নির্মাণে সক্রিয় ও গতিশীল ভূমিকা পালন করেছে। এই সক্রিয়তার গতি আরও বেশি পল্লবিত হয়েছে সামাজিক স্তরবিন্যাসের মাধ্যমে। তবে সামাজিক বিক্রিয়ায় কিছু অনুঘটক কাজ করে যা সামাজিক স্তরায়নের রসায়নকে প্রভাবিত করে। যেমন লিঙ্গীয় বৈষম্য, বয়স-বর্গ, পবিত্রতা-অপবিত্রতা, ধর্ম-অধর্ম প্রভৃতি। ভারতবর্ষের সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠী সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বী; তাদের ধর্মগ্রন্থ বেদ। বেদ অবলম্বনে সমাজ কাঠামো ব্যাখ্যায় দেখা যায় যে, সামাজিক শ্রম বিভাজনকে চারটি স্তরে বর্গীকরণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে এই বর্গীকরণ সামাজিক স্তরবিন্যাস ও আর্থ-সামাজিক কাঠামো নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বর্গগুলি হল: ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। সামাজিক স্তরবিন্যাসের কারণে এদের কাজও আলাদা হয়ে যায়। ফলস্বরূপ বুদ্ধিবৃত্তি ব্রাহ্মণের, প্রশাসন ও সমর প্রসঙ্গ ক্ষত্রিয়ের, ব্যবসা-বাণিজ্য বৈশ্যের ও যাবতীয় পরিচ্ছন্নতাকর্ম শূদ্রের কাজ হিসেবে নির্ধারিত হয়। ভারতবর্ষের এই সমাজ কাঠামো শক্ত ভীতের উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করে। 'বাংলাদেশে ভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায় সুদীর্ঘকাল একই সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়ে একই জনপদে পরস্পর সংলগ্ন হয়ে বসবাস করেছে। আপন স্বাতন্ত্র্যকে বিসর্জন না দিয়েও সে অন্যকে সাদরে গ্রহণ করেছে।'[১] অল্প দিনের মধ্যেই উপর্যুক্ত চার শ্রেণী-পেশার মানুষ পরস্পর পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তারা দৈনন্দিন জীবনের নানা প্রয়োজনে একে অপরকে সাহায্য সহযোগিতা করতে থাকে। কিন্তু এই সহযোগিতা পরস্পরের প্রতি সম্মানজনক আস্থা থেকে নির্মিত নয়, আরোপিত। ফলে নির্ভরশীলতা ও মানবিকতার বোধের চেয়ে সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা লাভের প্রবণতা বাড়তে থাকে। সমাজ নিয়ন্ত্রণের এই ক্ষমতা মানুষকে অধস্তনের প্রতি রূঢ় ব্যবহার করতে বাধ্য করে। কারণ ক্ষমতার পেছনের অন্ধ ঘোড়া হচ্ছে অপপ্রয়োগ; আরও স্পষ্টভাবে বললে শক্তির বক্র প্রয়োগ। শক্তির বক্র প্রয়োগের এই প্রবণতাও বেদ আশ্রিত বর্ণ বিভাজনের ফসল যা স্তরায়িত মানসিক বিভাজন তৈরি করেছিল। বেদে বর্ণিত পাঠ থেকে জানা যায় যে, যিনি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তৈরি করেছেন তিনি ব্রহ্মা নামে পরিচিত। ব্রহ্মার মাথার অংশ থেকে ব্রাহ্মণ, বক্ষস্থল ও বাহু থেকে ক্ষত্রিয়, উরু অর্থাৎ পদযুগলের উপরের অংশ থেকে বৈশ্য ও পায়ের তলা থেকে শূদ্র সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ ধর্মীয় বিশ্বাস ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজ কাঠামো ও সামাজিক স্তরবিন্যাসের এমন একটি গঠনরূপ দেয়া হয় যার মূল কথা হল সমাজ

নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা। সবিস্তারে বললে ক্ষমতার পরিকাঠামোই সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মূল ভূমি। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ বর্ণাশ্রম ভিত্তিক সমাজ কাঠামো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় সমাজ জীবন পরিচালনার মূল চালিকাশক্তি অর্থনীতিও এর আওতার বাইরে যেতে পারে না। ফলে সমাজ কাঠামো, সামাজিক স্তরবিন্যাস, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমতা এবং অর্থনীতি একই সুতোয় বাঁধা পড়ে। স্বাভাবিকভাবেই সমাজ নিয়ন্ত্রণের ভারপ্রাপ্ত উচ্চ সামাজিক শ্রেণী ব্রাহ্মণ গোষ্ঠী পুরো সমাজ নিয়ন্ত্রণ করেছে ধর্মবোধ আশ্রিত সামাজিক স্তরায়নের সুযোগে। সমাজে 'সাধারণ মানুষ' পীড়নের প্রকৃত শুরুটা এখানেই।

তিন

ধীরে ধীরে পুঁজিবাদ বিকাশের ধারায় সমাজ-অর্থনীতি নির্ধারিত নিম্নবিত্তরা হয়ে ওঠে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সামাজিক বৈষম্যের প্রলম্বিত ধারায় ভোগবাদী কায়েমী স্বার্থের একটি দুষ্ট চক্র নির্মিত হয় যারা অন্যের ঘাড়ে বন্দুক রেখে শিকার করাকে নিজের কাজ বলে মনে করে। আর যার ঘাড়ে বন্দুক রাখে তার জীবনের বিপন্নবোধকে কখনও অনুভব করে না। ঘাড়ে বন্দুক রাখা এই সাধারণকে নিশ্চল করে রাখে তার শ্রম ব্যবহারের মাধ্যমে পুঁজিকে অধিক সচল রাখতে। কিন্তু নিশ্চলতা চিরকালের নয়, আঁধারের অমানিশা কেটে স্থবিরতার দেয়াল ভেঙে সাধারণ মানুষেরা নিজেকে নিয়ে ভাবতে থাকে। 'রাজা বাদশাহর যুদ্ধবিগ্রহ যেমন সত্য; তেমনি এই সমাজ জীবনের প্রবাহিত হওয়ার ধ্বনিও সত্য।'[২] 'লোকজীবনের ধারণার সাথে একটা আপেক্ষিক নিকৃষ্টতাবোধ জড়িয়ে আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন সমাজের জীবন ও সংস্কৃতি উচ্চ ও নীচ দুটি পৃথক পর্যায়ে বিভক্ত হয়ে না পড়ে, ততক্ষণ সে সমাজে লোকসংস্কৃতির এবং লোকজীবনের পৃথক সত্তা কল্পনা করা যায় না। কিন্তু সুদূর প্রাচীন কাল থেকে আমাদের সমাজ ব্যবস্থা উচ্চ নীচ দুটো শাখায় বিভক্ত, সে কারণে এখানে লোকজীবন এবং লোকসংস্কৃতির প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক।'[৩] 'প্রাচীন বঙ্গদেশে অর্থনৈতিক জীবনের ভিত্তি ছিল শিকার, কৃষি ও সামান্য কুটির শিল্প। ধীরে ধীরে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অনেক পরে শিল্পের বিকাশ ঘটে।'[৪] সামাজিক ইতিহাসের নানা উপাদান ফোকলোরের মাধ্যমে আলোর মুখোমুখি হয়। ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, গল্প প্রভৃতির মাধ্যমে কখনও সরাসরি কখনও রূপক-প্রতীকের আশ্রয়ে আজন্ম লালিত নানা স্বপ্ন ও অভিজ্ঞতা প্রকাশিত হতে থাকে। সাধারণ মানুষের জীবন চর্যা ও মানস চর্চার সামগ্রিকতা ফোকলোরের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় বলে দৃঢ় সম্পর্ক রচিত হয় সামাজিক 'সাধারণ মানুষ' ও ফোকলোরের মধ্যে।

সমাজে বসবাসরত মানুষ ফোকলোরের মাধ্যমে স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা-বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটায়। দূর আকাশে প্রজ্জ্বলিত জ্যোতিষ্কের মত স্বপ্নের অধরা অবয়ব হাতের মুঠোয় এনে দুমড়ে মুচড়ে নির্মাণ করেন ফোকলোরের স্রষ্টা। জীবনবোধের কলাকৌশল ও বাস্তবতার নোঙরবিহীন ভাসমানতাকে সুতোয় মিলিয়ে তৈরি করেন শব্দের মালিকা। অর্থনৈতিক বিষয় বিবেচনার সাহায্যে সামাজিক 'সাধারণ মানুষ' ও ফোকলোরের সম্পর্কসূত্র জানা সম্ভব।

চার

সামাজিক জীবনে মানুষের জীবন চালানোর মূল চাবিকাঠি হল অর্থনীতি। মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যমে মানুষ দৈনন্দিন জীবনের চাহিদাগুলি মিটিয়ে থাকে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকে হাল আমলের অমর্ত্য সেন পর্যন্ত সকলেই অর্থনীতিকে মানুষের কেন্দ্রীয় চিন্তা-ভাবনার মৌল বিষয় বলে অভিহিত করেছেন। জীবন যাপনের

নিমিত্তে যে সকল মৌলিক চাহিদা নির্ণীত হয়েছে তার সব কিছু পেতে হলে মুদ্রা প্রয়োজন। চাহিদাগুলি হলঃ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা। সমাজ জীবনের অর্থনৈতিক বৃত্তে নিচের কোটিতে যাদের অবস্থান, অর্থাৎ যারা জীবিকার তাগিদে কারও অধস্তন সেই 'সাধারণ মানুষের' অর্থনীতির হালচাল জানা যায় তাদের ফোকলোরের সাহায্যে।

জীবনে টাকা নাই যার,
কিছু নাই তার।[৫]

মানুষের জীবনে যে কোন চাহিদা পূরণের জন্য সর্বপ্রথমে প্রয়োজন হয় টাকার। কারণ টাকার সাহায্যে অর্থাৎ মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির চাহিদা মেটানো সম্ভব হয়। সাধারণ মানুষ এই সহজ কথাগুলি ছড়া আকারে উপস্থাপন করতে পছন্দ করে। নাগরিক জীবনে বিনোদনের প্রভাব যতটা বেশি গ্রামীণ জীবনে (প্রথাগত অর্থে যেখানে 'সাধারণ মানুষের' বাস বেশি) ঠিক তার উল্টো, অর্থাৎ বিনোদনের মাধ্যমগুলি সংকুচিত। তাই তারা ছড়ার মাধ্যমে অভিজ্ঞতা আদান-প্রদান করে। ছড়াগুলি কখনও শুধুই বিনোদনের আবার কখনও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যম।

থাকত যদি আমার গলে
হীরামতির মালা
থাকত যদি আমার থলে
সোনার একটা থালা।[৬]

উল্লিখিত ছড়ার সাহায্যে সম্পদের প্রতি সাধারণ মানুষের মানসিকতা প্রতিফলিত হয়। নিজের গলায় হীরার মালা থাকার অর্থ তা নিজের সম্পদ হিসেবে গণ্য হওয়া। আবার সোনার থালা নিজের অধিকারে থাকা অর্থাৎ মূল্যবান সম্পদ নিজের অধিকারে থাকা বোঝায়। অর্থাৎ দু'টি বিষয়েই সম্পদ মুখ্য। আমরা যাদের 'সাধারণ মানুষ' বলি তাদের মানসিকতায়ও অর্থনীতি অন্যতম বিষয়। শুধু ছড়া নয়, ধাঁধাতেও একই রকম উদাহরণ পাওয়া যায়।

এমন একখান কাগজ
ধরা কিন্তু সহজ
পাবে দিলে
না পাবে না দিলে।
উত্তরঃ টাকা।[৭]

'একখান কাগজে'র মূল্যমান নির্ধারিত হয় টাকার অংকের সাহায্যে। টাকা পার্চমেন্ট কাগজ দিয়ে তৈরি হয়। এক এক দেশের মুদ্রা বিনিময়ের হার একেক রকম কিন্তু একটি বিষয়ে ঐক্য, তা'হল বিনিময়ের জন্য মুদ্রা আবশ্যক। ধাঁধার কথক টাকার গাঠনিক দিক বিবেচনা করে সহজে তা ধরতে পারার কথা উল্লেখ করেছেন। আসলে টাকা উপার্জন করা সহজ নয়। কথকের বিবেচনায় মানুষ যা চায়, টাকা দিলে তা পাবে আর না দিলে পাবে না।

ঘুড়ি নই আমি
তবু ঘুরি ফিরি

হাতে হাতে ঘুরি
এমনি আমার দাম
গরীব লোকের খাই ঘাম
বড়লোকে দেয় খাম।
উত্তর: টাকা।[৮]

ঘুড়ি আকাশে উড়ে আর তার নিয়ন্ত্রণ থাকে লাটাইয়ের সুতোয়। আকাশে ঘুড়ি যতই উড়াউড়ি করুক লাটাইয়ের মালিকের কাছে তাকে ফেরত আসতেই হবে। কারণ লাটাই মালিকের সাথেই তার আসল সম্পর্ক। জীবন যাপনের ক্ষেত্রে মানুষ যে বৃত্তেরই হোক না কেন তার টাকা প্রয়োজন। তাই গরীব বড়লোক সকলেরই টাকা প্রয়োজন। 'সাধারণ মানুষ' যারা কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে রোজগার করে তাদের স্বেদবিন্দু শুষে নেয় টাকা । আর এই টাকা ধনী মানুষেরা বহন ও নিরাপত্তার স্বার্থে মোড়কে অন্তস্থিত করে নেয়। কিন্তু টাকার মান তো সকলের কাছে একই।

টাকার এমনই দাম
তাতেই খানদান।[৯]

এটি লোকসমাজে প্রচলিত একটি প্রবাদ। টাকা শুধু দ্রব্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে নয়; আরও অনেক ক্ষেত্রেই প্রয়োজন হয়। যার টাকা আছে তার পক্ষে অর্থনৈতিক বৈভব, রাজনৈতিক পরাক্রম, সামাজিক উচ্চাসন অধিকার, সাংস্কৃতিক প্রতিভূ হিসেবে নিজেকে তৈরি করা অসম্ভব নয়। যিনি অনেক টাকার মালিক তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন বলে বিশ্বাস করেন সাধারণ লোকসমাজ। শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ শ্লেষের সঙ্গে উচ্চারণ করেন এমন প্রবাদ; কারণ তাদের শ্রমে নির্মিত সৌধে বাস করেন মালিক শ্রেণী। আগ্নেয়গিরির উত্তপ্ত লাভার মতো মানসিক বাসনার ফুটন্ত রূপ সাধারণ শ্রমজীবী লালন করেন তার মননে। কিন্তু সরাসরি প্রকাশ করতে পারেন না মালিক পক্ষের রক্তচক্ষুর কারণে।

অর্থ হল অর্থসহ
সবকিছু তৎসহ।[১০]

পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় পুঁজির মালিক যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন। কারণ তার অধীনে থাকে অনেক শ্রমজীবী মানুষ, যাদের জীবিকা তার অঙ্গুলি হেলনে অস্থিরতামুক্ত হয়। অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার কারণে তিনি রাজনীতি, সমাজনীতিসহ অনেক ক্ষেত্রেই নিজস্ব প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেন। 'মানুষের সামগ্রিক কর্মকা ও কীর্তিকলাপ এবং তার অবস্থান ও পরিবেশের মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে।'[১১] ফোকলোরের উপাদান বিশ্লেষণের সাহায্যে সমাজ ব্যবস্থার নিচের দিকে বসবাসরতদের মানসিক গড়নের একটি ধারণা লাভ করা যায়।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ:

১ আবুল হাসান চৌধুরী, *বাংলাদেশের লোকসংগীতে প্রেমচেতনা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০১), পৃ.২৩।

২ অরবিন্দ পোদ্দার, *মানব ধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ* (দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা: ইন্ডিয়ানা, ১৯৫৮), পৃ. ৫১।

৩ মুহম্মদ আবদুল খালেক, *মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে লোক-উপাদান* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫), পৃ. ৫২৬।

৪ মাহবুবুল হক, *বাংলার লোকসাহিত্য সমাজ ও সংস্কৃতি* (ঢাকা: গতিধারা, ২০১০), পৃ.৩০।

৫ নিজস্ব সংগ্রহ। মণি রাণী দাস (৪০), স্বামী: পিন্টু চন্দ্র দাস, গ্রাম: পূর্ব সুজালপুর, থানা: বীরগঞ্জ, জেলা: দিনাজপুর।

৬ নিজস্ব সংগ্রহ। বালক চন্দ্র রায় (৬০) পিতা: মতিলাল রায়, গ্রাম: মুকুন্দপুর, ডাকঘর: রামপুর, থানা: কাহারোল, জেলা: দিনাজপুর।

৭ নিজস্ব সংগ্রহ। নবন ভানু দাস (৩৬) পিতা: সবারত দাস, ঠিকানা: পূর্বোক্ত।

৮ নিজস্ব সংগ্রহ। স্বপ্না রাণী দাস (৪২), মিলন চন্দ্র দাস, গ্রাম: পূর্ব সুজালপুর, থানা: বীরগঞ্জ, জেলা: দিনাজপুর।

৯ নিজস্ব সংগ্রহ। উজলেফা বেগম (৩০), স্বামী: আহসান হাবীব, গ্রাম: মুকুন্দপুর, ডাকঘর: রামপুর, থানা: কাহারোল, জেলা: দিনাজপুর।

১০ নিজস্ব সংগ্রহ। মঞ্জু রাণী দাস (৪২), স্বামী: কান্ত চন্দ্র দাস, গ্রাম: পূর্ব সুজালপুর, থানা: বীরগঞ্জ, জেলা: দিনাজপুর।

১১ আবদুল মমিন চৌধুরী, 'বাংলার ভৌগোলিক পরিচয়', আনিসুজ্জামান ও অন্যান্য সম্পাদিত: *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৬), পৃ.১।